তারিখ ... 3 AUG 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩ ...

মেজর (অব.) সুধীর সাহা

শিক্ষক, তুমি আজও জেগে আছ কি?

আমাকে যদি প্রশ্ন করা হয়— বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে কোন সেক্টরে, তাহলে আমার উত্তরে যে কয়টি নাম আসবে তার মধ্যে অবশ্যই একটি নাম হবে শিক্ষাক্ষেত্র। শিক্ষাক্ষেত্রের ক্ষতিটি স্বাভাবিক চোখে দেখা যায় না অন্যান্য সেক্টরের মতো। তবে এটি ক্যান্সারের মতো। মরণব্যাধি ক্যান্সার যেমন জীবনকে ধুঁকিয়ে ধুঁকিয়ে শেষ করে দেয়, ঠিক তেমনি শেষ করে দেয় সমাজকে শিক্ষাক্ষেত্রের ব্যাধি। বেশ কয়েক বছর ধরে শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতির জোয়ার বইছে বলে বাগাড়ম্বর করে যাচ্ছে সরকার। স্কুল বাড়ছে, কলেজ বাড়ছে, বিশ্ববিদ্যালয় বাড়ছে, ছাত্রছাত্রী বাড়ছে, পাসের হার বাড়ছে, উচ্চশিক্ষার হার বাড়ছে ইত্যাদি ইত্যাদি দিয়ে হিসাবের খাতা একেবারেই পরিপূর্ণ। এমন হিসাবের খাতায় শুধু থাকছে না একটি চির সত্য বর্ণনা এবং তা হল শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ছে না, বরং কমছে। আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, প্রকৃত শিক্ষকের সংখ্যা কমছে। নদী বাড়ছে, খাল বাড়ছে, পুকুর বাড়ছে কিন্তু শুধু পানি কমছে সবক্ষেত্রে— এ যেন তেমন একটি বিষয়। সব আছে, শুধু আসল বস্তুটির অভাব। শিক্ষক বাড়ানোর, শিক্ষকের মান বাড়ানোর কোনো উদ্যোগ নেই। দলে দলে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করিয়ে সময় শেষে পাসের সার্টিফিকেট দিয়ে বেশ ভালো রোজগার করার লোকও বেড়েছে সমাজে। আলু-পটোলের ব্যবসা ছেড়ে তারা এখন দিব্যি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যবসায় নেমে পড়েছে। নামও ভালো, আবার আয়ও ভালো। আর এভাবেই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বুনিয়াদ। পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে শিক্ষক আর অফিসে চাকরি করা দুটি মানুষের সামাজিক ব্যবধানের মাপকাঠি।

শিক্ষক এখন আর দশটা চাকরিজীবীর মতো একজন। তাই তারও উদ্দেশ্য শুধু রোজগার করা ও আয় বৃদ্ধির মাধ্যম খোঁজা। চাকরিটিও পাওয়া যায় বেশ সহজে। থার্ড ক্লাস, সেকেন্ড ক্লাস এসব আর কে দেখে এখন! প্রয়োজন একজন শিক্ষক, তা যেমনই হোক। শিক্ষকটি জ্ঞানে-মানে কেমন তা দেখার সুযোগ নেই, শিক্ষকটি কোথা থেকে পাস করে বেরিয়েছে তাও দেখার প্রয়োজন নেই। শিক্ষালয়ে শিক্ষক নামের একজন চাকরিজীবীর প্রয়োজন। ব্যস, তেমন একজন পেলেই হল। প্রাইভেট স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এ কাজে অধিক সিদ্ধহস্ত। ক্রমেই বেড়েই চলেছে 'স্কুল অ্যান্ড কলেজ'-এর সংখ্যা; কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা। স্কুলের ব্যবসায় বাড়তি আয় বাড়াতে যোগ করে নিচ্ছে কলেজের নাম এবং অনুমোদন। সর্বত্রই চলছে এ খেলা। অনেক গল্প আছে এ নিয়ে। অন্যদিন না হয় বলব। আজ বরং অন্য একটি গল্প শেয়ার করি। আমার পূর্ব পরিচিত প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষিকা একদিন আমার কাছে এসেছিলেন। আমাকে তিনি বললেন, তিনি একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান। যখন সময় এলো তার কাজের সার্টিফিকেট দেয়ার, তখন তিনি আমাকে একটি প্রাইভেট কোম্পানির সিনিয়র এক্সিকিউটিভের সার্টিফিকেট দিলেন। আমার অবাক হওয়া চোখের সামনে তিনি বিশ্লেষণ করলেন, তার চাকরি ওই বিশ্ববিদ্যালয়েই। আবেদন, ইন্টারভিউ সবই হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিকার চাকরির জন্য। তিনি পড়ানও আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ছাত্রছাত্রীদের। কিন্তু নিয়োগপত্রটি দেয়া হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সিস্টার কনসার্ন কোম্পানি থেকে। কেন আর বলতে হল না আমাকে। তিনি গড়গড় করে বলে গেলেন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের রুল অনুযায়ী লেকচারার পদের জন্য প্রয়োজনীয় পাসের মান অর্থাৎ ক্লাস আমার তো নেই, তাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমার চাকরি দেখাচ্ছে তাদের অন্য ব্যবসায়ে; কিন্তু আমার কাজ পড়ানোই। আমার গল্পটি এখানেই শেষ। কোনো বিশ্লেষণের কি প্রয়োজন আছে কারও? তাই তো আমার আজকের লেখার প্রশ্নটি ছুঁড়ে দিয়েছি সেসব শিক্ষকের কাছে, যাদের অন্তত কিছুসংখ্যক আজও প্রকৃত শিক্ষক রূপেই আছেন। আজও যারা শিক্ষকের চাকরিকে ব্রত হিসেবেই নিচ্ছেন। প্রশ্নটি তাদের কাছে নয়, যারা নামে শিক্ষক আর কাজে অন্যকিছু, তাদের কাছেই প্রশ্ন।

আরও কিছু বলার আগে একটু তথ্য দিয়ে নেই। বাংলাদেশে মোট ৬৮৫টি অনার্স ও মাস্টার্স কলেজ, ১২৩টি মহিলা কলেজ এবং ৩৬৪টি বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ মোট ২ হাজার ১৯১টি কলেজ, ২১ লক্ষাধিক শিক্ষার্থী এবং ৬০ হাজারের বেশি শিক্ষক নিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এখনও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সংখ্যার বিবেচনায় বাংলাদেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়। মোট উচ্চশিক্ষার শতকরা ৭০ ভাগ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণ করে। এর বাইরে বিশেষ বিবেচনায় রাজধানীর ৭টি গুরুত্বপূর্ণ কলেজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দেয়া হয়েছে। শিক্ষা, তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ২০০৫ সালে দেশে বেসরকারি অনার্স কলেজের সংখ্যা ছিল ২০টি। ২০১০ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৮টি। ২০১৫-তে এসে এই সংখ্যা পৌঁছে ৩৪৩টিতে। সরকারি অনার্স কলেজের সংখ্যা ২০০৫ সালে ৪১টি, ২০১০ সালে ৫৮টি এবং ২০১৫ সালে ১০২টি। বেসরকারি মাস্টার্স কলেজের সংখ্যা ২০০৫ সালে ছিল ২৮টি, ২০১০ সালে ছিল ৩০টি এবং ২০১৫ সালে ৪৩টি। সংখ্যা বিশ্লেষণ করেই বুঝা যায়, কীভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে কলেজের সংখ্যা বেড়েছে। অথচ অবকাঠামোর কোনো উন্নতি তো হয়ইনি, বরং পুরনো অবকাঠামোতে ঘুণ ধরেছে অনেক ক্ষেত্রেই। এমন একটি বাস্তব অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হয়— যেহেতু অবকাঠামোগত উন্নতি নেই, যেহেতু শিক্ষকের মান ও সংখ্যা বৃদ্ধির কোনো প্রচেষ্টা নেই; তবে কী করে শুধু কলেজ-

বাস্তবে যেহেতু কেউ কখনও দেখতেও আসে না, তাই এখন আর খাতায় শিক্ষকের নামধামও খুব বেশি রাখার প্রয়োজন বোধ করে না - শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চালাক-চতুর মালিকপক্ষ। তাদের তো লক্ষ্য শুধু অধিক ছাত্র, অধিক মুনাফা; কম খরচ, কম শিক্ষক। অনার্স আর মাস্টার্স অনুমোদন পেলে সরকার থেকে অনুদানও বেড়ে যায়। তাই ওগুলো নিয়ে আসা। এরপর ক্লাস থাক আর না থাক, কে দেখতে আসে তা। ক'জন ছাত্র ক্লাসে আসে তা তো দেখার কেউ নেই। কলেজ কর্তৃপক্ষ তা দেখতে গেলে তাদের তো খরচ বেড়ে যাবে। নতুন ক্লাসরুম লাগবে, লাইব্রেরি লাগবে, খাতা-কলম-বেঞ্চ-চেয়ার এসবের খরচ বেড়ে যাবে, নতুন শিক্ষক লাগবে ইত্যাদি কত খরচ!

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে চলছে? অবকাঠামো ও শিক্ষক নেই— তাতে কী হয়েছে? হয়তো পরের বছরেই নতুন করে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালু করে দিচ্ছে কলেজটি। বিশেষ করে গ্রামের কলেজগুলো একের পর এক লাভ করছে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালুর অনুমোদন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর স্থানীয় রাজনৈতিক চাপ থাকে, তাই অনুমোদনের রাস্তা প্রশস্ত হয়ে যায়। কলেজে নেই যোগ্য শিক্ষক, নেই প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, ক্লাস হওয়ার নেই কোনো সুযোগ, ঠিকমতো ক্লাস হচ্ছেও না, কিন্তু তাতে কী! নতুন অনুমোদনে লাফাচ্ছে সবাই। যেন আকাশের চাঁদ পাওয়া গেছে। কিন্তু এই চাঁদ যে শিক্ষা দিচ্ছে না, শিক্ষিত করছে না, শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি করছে না— তার হিসাব করছে না কেউ। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে শত শত বেসরকারি কলেজ অনার্স-মাস্টার্স শ্রেণী চালু করেছে ঠিকই, কিন্তু তারপর সেই কলেজের অবস্থাটি কেমন তা কি দেখছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ? কলেজের গুণগত মান নিশ্চিত করতে, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বিদ্যমান আছে কি-না তা পর্যবেক্ষণ করতে, নিয়ম অনুযায়ী পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক পাঠদানে নিয়োজিত আছেন কি-না, নিয়মিত ক্লাস হয় কি-না এবং পর্যাপ্ত শ্রেণীকক্ষ ও ক্লাসের পরিবেশ আছে কি-না তা পর্যবেক্ষণ করতে কখনও কি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোনো কলেজে গিয়ে দেখেছেন? যোগ্য শিক্ষক নেই, ভালো মানের গ্রন্থাগার নেই, ছাত্রছাত্রীদের বসার মতো পর্যাপ্ত শ্রেণীকক্ষ নেই— তবুও কলেজ, তবুও অনার্স-মাস্টার্স পাঠদানের অনুমোদনপ্রাপ্ত কলেজ।

আমাদের সমাজের অবকাঠামোগত দুর্বলতার বিষয়ে কারও কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তাই বলে শিক্ষাক্ষেত্রেও! শিক্ষায় ধস নামলে তো সবই শেষ! এই জায়গাটুকুও কি আমরা সুস্থ রাখতে পারি না? যেখানে হয়তো একটি স্কুল চলার মতো পর্যাপ্ত সুযোগ নেই, সেখানে যদি কলেজ করে বসেন তবে তার ফল কি ভালো হতে পারে? এখানেই শেষ নয়, কারা হচ্ছেন কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকা? বিশেষ করে গ্রামের কলেজগুলোতে? শিক্ষক কে হবেন? গ্রামের যে লোকটি কোনোভাবে 'পাস' নামের একটি বৈতরণী পার করে এসেছেন, আর এগোনোর ইচ্ছা করেনি, যিনি না বোঝেন শিক্ষা, না বোঝেন শিক্ষার মান— সেই একজন যদি হয়ে বসেন শিক্ষক, তবে তিনি কি-ই বা বুঝবেন আর কি-ই বা পড়াবেন? তার হাতে গড়া ছাত্রছাত্রীর মানই বা কী হতে পারে? এমন শিক্ষক, এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এমন ছাত্রছাত্রী কি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সামনের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে, না খাদের কিনারে নিয়ে যাচ্ছে? অনেককিছুই আমাদের তলিয়ে গেছে। গ্রামের মাতবর ভাই এখন আর আগের মতো নেই, বিচার করে পক্ষে রায় দিতে এখন রীতিমতো ফি নিয়েই ছাড়ে। তার যুক্তি আছে, সবাই তো যার যার স্বার্থের কথা ভাবে, তবে আমি নই কেন? গুড় ব্যবসায়ী ভাই, গুড়ে যেন কী মিশিয়ে বিক্রি করে; ফলে দুটো বেশি পয়সা আসে। এই বাড়তি দুটো পয়সার কথা সমাজের অনেকেই তো ভাবছে আজকাল। অফিসের বড় সাহেব থেকে শুরু করে পিয়নও ভাবেন; ব্যবসায়ী-ইঞ্জিনিয়ার কেউ আর বাদ পড়ে না এখন এমনটা ভাবতে। সব দেখে শিক্ষকরা মনে করেন, তবে আমরাই বা বাদ যাব কেন? আমার প্রশ্নটি— তাই বলে শিক্ষাক্ষেত্রেও?

ছাত্র গড়ার পেছনে ছাত্র, অভিভাবক ও শিক্ষককে সময় দিতে হয়, কঠিন পরীক্ষা দিতে হয়; একসময় এমনটাই তো ছিল নিয়মের মধ্যে। আজকাল এসবের ধার কে ধারে? চটপট করে সময়টা কেটে গেলেই চমৎকার কাগজে একখানা সার্টিফিকেট। তাই নিয়ে কর্মক্ষেত্রে, তা সেটি শিক্ষালয়েই হোক কিংবা চকবাজারের পাইকারি দোকান। শিক্ষক হলে ভালো হয়, সমাজে একটু ভালো মর্যাদা পাওয়া যায়। কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে এখন কোনো পার্থক্য গ্রহণ করতে রাজি নয় বেশিরভাগ শিক্ষক। তাদেরকে তো আর তৈরি করতে হয় না। একসময় ছিল যখন ছাত্রদের মতোই শিক্ষকদেরও তৈরি করতে হতো। কিন্তু এখন তো আর ছাত্ররা ক্লাসে বেশি আসে না। মাস শেষে বেতন দিয়ে দিলেই হয়ে যায়। শুধু পরীক্ষার সময় একটু বাড়তি ঝামেলা পোহাতে হয়। কোনোরকম ম্যানেজ করলেই ঝকঝকে একটি সার্টিফিকেট। মাঝখানে তাহলে শিক্ষকের কাজটি কোথায়? কোথাও না। সুতরাং ভাবখানা এমন যে, কলেজে শিক্ষক আছে কী নেই, ভালো শিক্ষক আছে কী নেই— এতকিছু বিবেচনায় আনার প্রয়োজন কী। খাতায় নাম রাখার জন্য তাই কলেজের একটু-আধটু চেষ্টা থাকে, যদি কখনও কাউকে দেখাতে হয়। বাস্তবে যেহেতু কেউ কখনও দেখতেও আসে না, তাই এখন আর খাতায় শিক্ষকের নামধামও খুব বেশি রাখার প্রয়োজন বোধ করে না শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চালাক-চতুর মালিকপক্ষ। তাদের তো লক্ষ্য শুধু অধিক ছাত্র, অধিক মুনাফা; কম খরচ, কম শিক্ষক। অনার্স আর মাস্টার্স অনুমোদন পেলে সরকার থেকে অনুদানও বেড়ে যায়। তাই ওগুলো নিয়ে আসা। এরপর ক্লাস থাক আর না থাক, কে দেখতে আসে তা। ক'জন ছাত্র ক্লাসে আসে তা তো দেখার কেউ নেই। কলেজ কর্তৃপক্ষ তা দেখতে গেলে তাদের তো খরচ বেড়ে যাবে। নতুন ক্লাসরুম লাগবে, লাইব্রেরি লাগবে, খাতা-কলম-বেঞ্চ-চেয়ার এসবের খরচ বেড়ে যাবে, নতুন শিক্ষক লাগবে ইত্যাদি কত খরচ! বরং এসব না করে ছাত্রদের শুধু রেজিস্ট্রেশন করিয়ে সময়মতো বেতনটা আদায় করলেই কি লাভ বেশি না? কে আসল, কে আসল নয়— তা তো আর কেউ দেখতে আসছে না। আমার ব্যবসা আমি সামলাব, তাতে আপনার কী? সমাজের কী? সরকারের কী? জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কী? বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কী? থাকুন না বরং যার জায়গায় সে শান্তিমতো।

এমন একটি সমাজ ব্যবস্থায় ক'জন আছেন যারা প্রতিবাদ জানাতে চায়, বিশেষ করে সেসব শিক্ষক যারা আজও গাধা পিটিয়ে মানুষ গড়ার স্বপ্ন দেখেন। এই লেখাটি হয়তো তাদের আরও সোচ্চার হতে সাহায্য করবে বলে প্রত্যাশা।

মেজর (অব.) সুধীর সাহা : *কলামিস্ট*